তারাশঙ্কর ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

সরোজ দত্ত

গত ৫০-৫৫ বছরের মধ্যে এমন কতকগুলি বাঙলা উপন্যাস লেখা হয়েছে, যাদের মধ্যে সামাজিক রূপান্তরের চিহ্ন কোথাও আলতোভাবে, কোথাও বা বেশ গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। কারো হাতে ব্যাপারটা লিখতে লিখতেই এসে গিয়ে থাকবে, আবার কেউ কেউ যে বেশ সচেতনভাবেই ব্যাপারটাকে টেনে এনেছেন, সে-ও বোঝা যায়। পথিকৃৎ সম্ভবতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পথের পাঁচালী" (১৩৩৬) উপন্যাসে প্রথম এরোপ্লেন উড়তে দেখা গিয়েছিল নিশ্চিন্দিপুরের আকাশে। সেখানকার নিরুৎসুক অধিবাসীরা বড় একটা আগ্রহ দেখায় নি ব্যাপারটায়, আর উপন্যাসেও এ-ঘটনার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। কুড়ি বছর পরে বিভূতিভূষণ তাঁর "ইছামতী" উপন্যাসে সামাজিক ভাঙ্গাগড়াকে বেশ দক্ষ হাতে আঁকলেও, তার মধ্য থেকে বিভূতি-ভূষণের সমাজ-জিজ্ঞাসার কোনো পরিচয় আমরা পাইনা। সমাজ-সচেতন লেখক হিসেবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা স্বীকৃতি আছে। তাঁর "পুতুল-নাচের ইতিকথা" এবং "পদ্মানদীর মাঝি"—দুটি উপন্যাসই প্রকাশিত হয় ১৩৪৩-এ। কিন্তু শশী যেমন গোপালের হাতের অর্বাচীন ক্রীড়নক, কুবেরও তেমনি হোসেন মিয়া-র হাতের পুতুল। দ্বিধা, দুর্বলতা, ভীরুতা, অসহায়তা, গোপন বাসনা, এই শশী এবং কুবের চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। পরিবেশ-পরি-স্থিতিকে আয়ত্ত করবার শক্তির কথা না হয় না-ই ভাবা গেল, তাকে বোঝবার উপযুক্ত ইচ্ছাটাও এদের মধ্যে ফুটে ওঠেনি। বাইরের চাকচিক্যে শশী-কে কুবেরের তুলনায় একটু বেশি মার্জিত মনে হয় এইমাত্র, অন্যথায় চরিত্রদুটির মূল কাঠামো অভিন্ন। তাদের ব্যক্তিগত জীবনকথার মধ্যে অন্য যে-সব বৃহৎ তাৎপর্যের কথা ভাবা হয় তার অনেকটাই আরোপিত। বরং বছর চার-পাঁচ পরে "শহরতলী" উপন্যাসের দুটি খণ্ডে তিনি যে-সব চরিত্র নিয়ে তাঁর কাহিনীর আখ্যানভাগ গড়ে তুলেছেন, তারা শশী বা কুবেরের মতো এতটা জড় নয়। সময়ের পরিবর্তনকে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই পায়। ক্রমশঃ আমরা এই ধারাতেই আরো কিছু উপন্যাস রচিত হ'তে দেখি, যেমন—সঞ্জয় ... তারাশঙ্করের "গণদেবতা" (১৩৪৯),

... (১৩৫১), হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" (১৩৫৪), সতীনাথ ভাদুড়ীর "ঢোঁড়াইচরিত মানস"-এর দুটি খণ্ড, প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৩৫৬ ও ১৩৫৮। ইতিমধ্যে ১৩৫৭-তে গুণময় মান্না লিখেছেন "লখীন্দর দিগার", ষাট-এর দশকে তিনি সম্পূর্ণ করেছেন দুখণ্ডে সমাপ্ত তাঁর বৃহদায়তন উপন্যাস "জুনাপুর স্টীল" আরো পরে "শালবনী"। অমিয়ভূষণ মজুমদারের "গড় শ্রীখণ্ড"র প্রকাশকাল ১৩৬৩। এই সময়সীমার মধ্যে বা সামান্য আগে পরে লেখা আরো কিছু উপন্যাসের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। অদ্বৈত মল্ল বর্মণের "তিতাস একটি নদীর নাম", সমরেশ বসুর "বি. টি. রোডের ধারে" "জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর "বারো ঘর এক উঠান" এবং হয়তো মনোজ বসুর "বন কেটে বসত"-কেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আর সাম্প্রতিককালে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর "অরণ্যের অধিকার" এবং "চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর" এই তালিকায় সম্ভ্রান্ত সংযোজনা। বেশ বোঝা যায়, জলের বুকে স্রোতের টান ক্রমশঃ প্রখর।

কোনো সন্দেহ নেই যে, কাহিনীর বিষয় নির্বাচন, আবেদন ও পরিণামগত দিক থেকে উপন্যাসগুলির মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটাই বড়। আবার এ-ও বেঠিক নয় যে একটা সাধারণ সূত্রে ধরা যায় ব'লেই উপন্যাসগুলিকে একসঙ্গেই নেওয়া যায়। হয়তো তিতাসের তীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে-ভাবে হারিয়ে যায়, উৎসাদিত হবার পরও "বন কেটে বসত"-এর দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী সেভাবে হারিয়ে না গিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জীবনের খোঁজে নতুন বসতি গ'ড়ে তোলে, হয়তো কলে-খাটা করালীর মধ্যে "জুনাপুর স্টীল"-এর বিদ্রোহের দীপ্তি নেই ; হয়তো 'শহরতলী"-র মানুষেরা বারো ঘরের এক উঠোনে জড়ো হ'য়ে অবনমনের ভূমিকাটাকে তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করেনা ; এবং হয়তো "মরামাটি" বা "গড় শ্রীখণ্ড"-র মানুষেরা চোট্টিমুণ্ডার মতো ব্যূহ রচনায় তেমন সমর্থ নয়—তা হ'লেও যেখানে তারা অভিন্ন সেটা এই যে এইসব উপন্যাসের মানুষের জীবন চলমান সময়ের আধার হ'য়ে উঠতে পেরেছে। সময় এদের জীবন ছুঁয়ে গিয়েছে কোথাও রাজনৈতিক, কোথাও অর্থনৈতিক, কোথাও সামাজিক আবার কোথাও বা মিশ্র চলন-ধর্মে। উপন্যাসের নরনারী কেউই আপন অন্তরালে খুব একটা দুর্গম নয়, বরং দেশকালের মাত্রাতেই তাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ। গত পঞ্চাশ বছরে বাঙলা উপন্যাসের একটা প্রবল সত্য চলমান জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ-বিধান। স্বভাবতঃই এই বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই তারাশঙ্করের "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা"-ও ঐ

বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে।

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে সমালোচকেরা কয়েকটি বিষয়ে একমত। তারাশঙ্কর তাঁর বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে নিবিড় প্রশ্রয়ে তিনি গ্রামের নীচুতলার মানুষদের কথা বলেন, সেই একই মমতা এবং সহানুভূতি থেকে তিনি কীর্তন করেন পতনোন্মুখ জমিদারতন্ত্রের মহিমা। করালীর মধ্য দিয়ে তিনি নতুন বাস্তবতাকে আঁকতে স্পৃহা বোধ করেন বটে কিন্তু বনোয়ারীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব গোপন থাকে না; কেননা এই পরিবর্তন তিনি ধরবার চেষ্টা করেন শুধুই বুদ্ধির সাক্ষ্য মারফৎ, তার পিছনে তারাশঙ্করের অধ্যাত্মসম্মতি নেই। এই পরিবর্তনের অনিবার্যতার স্বপক্ষে তাঁকে তেমনি উৎসাহিত হ'তেও দেখা যায় না, যেহেতু এই পরিবর্তন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন নয়। নিজের অন্ধ, আদিম, বলিষ্ঠ আবেগের সামর্থ্যে তিনি নিয়ন্ত্রিত করতে চান কালস্রোতের স্বচ্ছন্দ গতিকে। এই আকাঙ্ক্ষার মূলে আছে তারাশঙ্করের নীতি-নিরপেক্ষ অদম্য এক প্রাণ-পিপাসা, সেই কারণে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বা ঐতিহাসিক পক্রিয়ায় তিনি বিশেষ আস্থাশীল নন। এখান থেকেই উঠে আসে তাঁর অতীতের প্রতি মোহমুগ্ধ একটা দৃষ্টি, আর ঠিক সেইখানেই এসে তারাশঙ্করের কাছে ব্যাহত হয় নতুন কালের মানুষের উদ্যোগী পুরুষকার। তারাশঙ্করের ব্যক্তিজীবনও এই দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ক ব'লে মনে করাও হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশের সন্তান হিসেবে সামন্ততান্ত্রিক উদারতার দিকটিও তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে চিত্রিত হ'তে দেখা যায়। সময় কারো মুখাপেক্ষী নয়—একথা ভুলে গিয়ে তারাশঙ্কর যখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অভিরুচিকে এতটা প্রাধান্য দেন, তখন তাঁর রচনায় যে মহৎ শিল্পের নির্বিশেষ লাবণ্যের অভাব সূচিত হয়, সমালোচকের প্রখর দৃষ্টি সেখানেও সজাগ।

শুধু যে তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাস থেকেই এ-সব কথা মনে আসে তা-ই নয়, তার আত্মকথাগুলিতে, বিশেষ করে "আমার কালের কথা"-য় স্বয়ং তারাশঙ্করই এই সূত্রগুলিকে তাঁর পাঠক এবং সমালোচকদের হাতে তুলে দেন। যথেষ্ট দার্ঢ্যের সঙ্গেই তিনি সেখানে বলেছেন, তাঁর মন সেকাল-কে কালাপাহাড়ের ভাঙ্গা-প্রতিমার মতো বিসর্জন দিতে পারে না। অথচ সেকাল নিয়ে যে বড় বেশি গর্বের কিছু নেই, সে-সব কথা তারাশঙ্করই উপস্থিত করেন সঙ্গে সঙ্গে। পরিবর্তন যখন প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এসেছে, তখনই শুরু হয়েছে অর্থ নৈতিক বিপ্লব এবং গ্রামের অর্থ চ'লে গিয়েছে বাইরে। শক্তি-

সামর্থ্যহীন ভীরু দরিদ্র গ্রামের মানুষদের সাধ্য ছিলনা শহরে গিয়ে, কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থেকে সে অর্থ গ্রামে ফিরিয়ে আনা। সে সংঘাত থেকে তারা বরং পরিত্রাণের পথ খুঁজেছে পশ্চাদপসরণের মধ্য দিয়ে। শুধু গ্রামের দরিদ্ররাই বা কেন, তাঁর কালের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের মধ্যেও সেই সাহসের চিহ্নমাত্র দেখেন নি তারাশঙ্কর। বরং এই বিপর্যয় বিকৃতিই এনে দিয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে। তারাশঙ্কর সাক্ষী—তাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত ক্লেদ যত পঙ্ক সবই তারা নিক্ষেপ করেছে ঐ হতভাগ্য দরিদ্রদের জীবনে, বিষিয়ে দিয়েছে তাদের জীবনপাত্র। দেখেছেন তারাশঙ্কর "অসহায় মানুষেরা মানত করেছে, পূজা করেছে, ভাল করেছে, মন্দ করেছে, যা কিছু করেছে দেবতার নাম নিয়ে। তান্ত্রিক মদ খেয়েছে কালীমা-র নাম করে, শৈব গাঁজা মদ সিদ্ধি খেয়েছে শিবের নাম করে, বৈষ্ণব গাঁজা খেয়েছে গোবিন্দর নাম করে"। তাদের ঘৃণা করতে পারেন না তারাশঙ্কর, বেদনা অনুভব করেন তাদের জন্যে। আর সেই সঙ্গে সন্ধানে রত থাকেন সর্বখর্বতার দাহ থেকে কোনো অস্তার্থক প্রত্যয়কে খুঁজে নিতে—যাকে তিনি বলেছেন "নির্মাল্যের সন্ধান"।

নতুন কাল এবং হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের জীবনে সেই কালের প্রতিভূ করালীকে কিন্তু তারাশঙ্কর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এইজন্যেই বনওয়ারীর চোখে মেলে দিয়েছেন এক মুগ্ধদৃষ্টি: "আজই যেন করালীকে সে নতুন করে দেখলে। নোড়ার কাজের জন্য কুড়িয়ে আনা নুড়িটাকে আলোর ছটায় জ্বলতে দেখে মানুষ যেমন সবিস্ময়ে সাগ্রহে সসম্ভ্রমে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তেমনিভাবে তাকে দেখল বনওয়ারী"। ভাবনা তার গড়িয়ে যায় আরও অনেক দূরে: "করালী যদি 'ধরম' তাকিয়ে ইজ্জৎ রেখে সোজা রাস্তায় চলে, তবে করালী হতেই কাহারপাহাড় অনেক 'হিতমঙ্গল' হবে বলেই বনওয়ারীর বিশ্বাস। নইলে ও-ই উচ্ছন্ন দেবে কাহারপাড়াকে। টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওই ওই কলকারখানার তেলকালি-ভরা আলক্ষীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়। ছেলেগুলো চাষ ছাড়বে, পাল্কীবহন ছাড়বে, পিতি-পুরুষের কুলকর্ম জলাঞ্জলি দেবে। মেয়েরাও যাবে পিছনে পিছনে। বনওয়ারী তা হতে দিতে পারবে না। কখনও না। তাই সে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে আদর করে তার আবদার রেখে কোলগত করে নিতে চায়"। সমগ্র কাহারপাড়ার হিতাহিতের বাইরে বনওয়ারীর ব্যক্তিজীবন বিশেষ নেই। কাহারদের

Scanned by TapScanner

বসতি যে হাঁসুলীবাঁকে, সেখানকার মাটিতে, মাটির অন্নে বনওয়ারী নিজের প্রাণের গন্ধ খুঁজে পায়, সেখানকার বাতাসই তার শ্বাস-প্রশ্বাস, সেখানকার সূর্যের তেজেই বনওয়ারীর মধ্যে শক্তিসামর্থ্যরূপে ফুটে ওঠে, কাহারদের জীবনের উৎসবেই বনওয়ারীর প্রাণস্পন্দন। এই কাহারপাড়ার তথা কাহারদের হিতার্থেই করালীর শক্তিকে তার দরকার। করালী শক্তিমান। সেই শক্তির অপচয় নিবারণার্থেই মাতব্বর হিসেবে বনওয়ারী করালীর প্রতি তার শাসনের কাঠিন্য শিথিল করেছে, লঙ্ঘন করেছে কাহারদের ন্যায়শাস্ত্রের বিধান। অন্যথায়, নয়নের সঙ্গে পাখীর ছাড়পত্রের আগেই পাখীকে নিয়ে করালীর শহরে যাওয়া হাঁসুলীবাঁকের সামাজিক বিধানে গুরুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। সেই দণ্ডবিধানের পরিবর্তে মাতব্বর বনওয়ারী পাখী-করালীকে হাঁসুলীবাঁকে ফিরিয়েই এনেছে। সমাজহিতের ভাবনা থেকে তারাশঙ্কর সম্ভবতঃ বনওয়ারী-করালীর একটা সন্ধির কথা ভেবেছিলেন, চেয়েছিলেন পুরনোর সঙ্গে নতুনের একটা সঙ্গতি বিধান করতে।

করালীর শক্তির অপচয় নিবারণের মতো পাখীর ভবিষ্যৎকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষার কথাও, মাতব্বর হিসেবে বনওয়ারীকেই ভাবতে হয়। না হ'লে হাঁসুলীবাঁকের আর এক মেয়ের মতো—সিধুর মতো—পাখীর জীবনও 'আস্তাকুড়ে' গড়িয়ে যেতে পারে : "সিধু এখন আঁস্তাকুড়ের অন্নের সমান। আঁস্তাকুড়ে যে অন্ন পড়ে, সে অন্ন আর তুলে নেবার উপায় নেই। কিন্তু সে অন্নও তো লক্ষ্মী! তার জন্য মন না কেঁদে তো পারে না"। বিশুষ্ক বা বিশীর্ণ কোনো নৈতিকতা তারাশঙ্করের সংবেদনশীলতার অবসান ঘটাতে পারে না। তাঁর জীবনভাবনার মূলে আছে এই প্রবল সহানুভূতি, অকৃত্রিম মমতাবোধ। অবশ্য গ্রামের জীবনে এই কলুষ যে কাহার-কন্যাদের স্পর্শ করে না এমন নয়। কিন্তু তাকে তারা বিধির বিধান হিসেবে মনে করে ব'লেই একধরণের সহনশীলতার মধ্যদিয়েই কাহারেরা মেনে নেয় তাদের বউ-ঝিদের এই আচরণ। পাখীর মা, বসন, নিত্যরাত্রে বেশভূষা সেরে একাই চ'লে যেত বাবুদের বাগানবাড়িতে। এখনও উচ্চবিত্তদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক যত গ্লানি এই অন্ত্যজ জাতির মেয়েরাই ধারণ করে—কাহারপাড়ায় সোরগোল জাগে না তাতে। পাপ-পুণ্য, মেয়েদের সতীত্বের মূল্য কাহারপাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী বোঝে, "কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎজাতেরা, তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎজাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণ সেবা করে

হাড়ি ডোম বাউড়ী কাহার। শ্মশানে থাকে চণ্ডাল। বিধির বিধান এ সব। কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা? কাজেই কাহার জন্মের এ কর্ম যে স্বীকার করতেই হবে"।

বিধির বিধান ব'লে এসব মেনে নেওয়ার মধ্যে বনওয়ারী তথা কাহারদের আরেকটা আশ্বাসের জায়গাও আছে—"বিপদে আপদে মনিবেরা অনেক করেন। কাহারেরা স্বীকার করে মুক্ত কণ্ঠে—অ্যানেক অ্যানেক করেন। অসুখে-বিসুখে খোঁজ করেন, কিছু হলে দেখতে পর্যন্ত আসেন, পয়সা কড়ি ধার দেন, পথ্যের জন্য পুরানো মিহি চাল, আমসত্ত্ব, আচার এমনিতেই দেন, বিনটন কিছু ঘটলেও তত্ত্বতল্লাস করতে আসেন। রতনদের দুঃখে নিজেও হেদো মণ্ডল কাঁদেন, আপ্তবাক্য বলেন, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, তাতে সত্যই অন্তর জুড়িয়ে যায় রতনদের"। বনওয়ারী, রতন, পরম—মণ্ডল, বাবুমশাইদের 'আশ্চয়' ক'রেই তারা জীবনধারণ করে। তাদের জীবনবোধ বড়ই অব্যবহিত, সেইসঙ্গে তাদের জীবনদেবতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কও। তাদের বাসস্থানই তাদের দেবভূমি। সেখানকার বেলগাছে তাদের দেবতা 'কালারুদ্দু'র বসত, ভয়ঙ্কর কালসাপ সেই দেবতার বাহন। চেনাশোনার বাইরে কিছু নেই কাহারদের জীবনে; কোনো ভাবের দেবতার অন্বেষণে গরজ বোধ করে না তারা : "এ দুনিয়া আজব কারখানা।···বাউল আসে, বৈষ্ণব আসে, সন্ন্যেসী আসে, সবাই ঐ এক কথাই শুনিয়ে যায়। কাহারেরা শোনে, ভাবে। আগে দেহের খাঁচায় অদেখা অচেনা পরাণ-পাখীর কথা ভেবে কথাটা স্বীকার করত। মায়ের 'গভ্যে'র মধ্যে বসে কারিগর খাঁচা তৈরি করে—হাড়ের শলা তৈরী করে পরিপাটি চামড়ার ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দেয়, তার মধ্যে ফুড়ুৎ করে এসে ঢোকে একটি পরাণ-পাখী।···তারপরে আবার একদিন ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। ভেবে ভেবে কুল কিনারা মিলত না, কাহাররা 'পিতিপুরুষ'-ক্রমে নীলবর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে 'পরাণ-পাখী'র আনাগোনার পথের দাগ আর সেই আজব কারিগরের আস্তানা খুঁজত, খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বাবাঠাকুরের বেলতলায় এবং 'কালারুদ্দে'র দরবারে লুটিয়ে পড়ে বার বার বলত—অপরাধ মাজ্জনা কর বাবা! কোলের কাছে অন্ধকার, তুমি 'অইচ' পক্ষ দিয়ে ঢেকে, বক্ষ দিয়ে আগুলে,—আর তোমাকে আমরা খুঁজে মরছি কোথা কোন্ বেহ্মাণ্ডে বেহ্মাণ্ডে"। আসলে ভূমি, নারী, শ্রমসামর্থ্য আর প্রত্যক্ষতা—এই চতুঃসীমার মধ্যেই হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের জীবন বিস্তৃত। আর কোনো ভাবনায়

ভাবিত নয় তারা। নতুনকাল তাদের জীবনকে স্পর্শ করে ঠিকই এবং স্পর্শ ক'রেই ছিটকে দেয় তাদের মূল প্রবাহ থেকে। অতঃপর পার্শ্বস্থ তটরেখায় তাদের অচট জীবন-যাপন, সেইখানেই তারা তাদের কর্মক্লিষ্ট প্রাণ কোনোমতে বাঁচিয়ে রাখে। এইভাবেই তাদের জীবন হয়ে ওঠে উদাসীন অন্ধ নিয়তির মতো নির্মম সময়ের বিচিত্র রঙ্গভূমি—সময় তাদের প্রাণচঞ্চল করে না, পযুর্দস্ত করে। আর করালী আসে তারই দোসর হ'য়ে।

করালী তাদের স্থিরনিশ্চিত জীবনের ভিত্তিতে আঘাত ক'রেই তাদের বিবশ, বিভ্রান্ত এবং ম্রিয়মাণ ক'রে ফেলে। বাবার বাহনকে করালী পুড়িয়ে মারে, বাবুদের নামে চন্নপুরের ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসে নালিশ করে, দরখাস্ত ক'রে সে সজাতির জন্যে প্রয়োজনে কেরোসিনের বন্দোবস্ত করে। মোড়লদের সঙ্গে, বাবুদের সঙ্গে আবহমান কালের সম্পর্কও সে ছিন্ন করতে চায়: "বলি—বেটা কিসের মশায়, বেটা? বলেই সে হন হন করে চলে গেল। বলতে বলতে গেল—বেটা শালা হারামজাদা গুখোর বেটা নেগেই আছে—ভদ্দ-নোকের মুখে নেগেই আছে। ভদ্দনোক! মাথা কিনেছে! অঃ—"

স্পষ্টতঃই করালী 'বিধির বিধান' বলে নম্র নতমুখে এসব মেনে নিতে পারেনা—অভ্যস্ততার বিরুদ্ধে এ তার স্পষ্ট প্রতিবাদ। শিরোধার্য করা নয়, শির তুলতেই চায় করালী। তার কথাগুলি যে নিতান্ত মিথ্যা নয়, কাহারদের মধ্যে এমন একটা চেতনার অস্ফূট অঙ্কুরও দেখা যায়। তথাপি, করালী দৈত্য কিম্বা শয়তান, না কি রাজপুত্র সে, নতুনকালের মাতব্বর—এই সংশয়ে কাহারেরা পীড়িত হ'তেই থাকে। কারণ, তাদের জীবনে বেদ-উপনিষদের অভিজাত দেবতা বা বিশ্বস্রষ্টার কোনো ভূমিকা নেই; কিন্তু তাদের "ঈশ" বা উপাস বাবা 'কালারুদ্দু'-র আবাসস্থল যে বেলগাছ, তার নীচের মাটি যে বাবার থান, বাবার বাহন, এমনকি যে-সব প্রভুদের—ঘোষ, চৌধুরী বা মণ্ডলদের—সান্নিধ্যে বা স্পর্শে তারা তাদের লৌকিক দেবতার লোকায়ত স্পর্শ লাভ করে, সে-সব অবহেলা করা মানেই কাহারদের জীবনকে নিঃসম্বল ক'রে দেওয়া—এই শূন্যতায় তারা কেমন ক'রে বাঁচে!

সমাজ-ইতিহাসের দিক থেকে মিথ্যে না হ'তেও পারে যে এই ধরনের জীবনবোধের পিছনে আছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাবিহিত শোষণের গোপন চক্রান্ত। মানুষ যেখানে দ্বিপদ প্রাণী মাত্র, সেখানে মানুষের মাপে চাইবার মতো মানসিকতা তারা পাবে কোথায়? তাই ঘোষ-চৌধুরী-মণ্ডলদের 'আশ্রয়'

ক'রেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়—সেই তাদের সৎসঙ্গ, সেই তাদের স্বর্গবাস। উপরে থাকা সৎজাতেরাও জানেন, যদি সামান্য দাক্ষিণ্য বিতরণের মধ্যেই অন্ত্যজ শ্রেণীর নির্ভরতার ঘোরটাকে নিবিড় ক'রে দেওয়া যায়, তা হ'লে সেই সামান্য বিনিয়োগের সুযোগেই পুরুষ-পরম্পরায় তাদের জীবনীশক্তিকে যথেচ্ছ ব্যবহারের অক্ষয় অধিকার বজায় থাকে। এই অবস্থায় তারা ভোলবার অবকাশই পায় না যে তাদের জীবন ঐ সৎজাতির চরণসেবাতেই উৎসর্গীকৃত। বরং কালে কালে অনুসৃত হ'তে হ'তে এ-আচরণ এমন একটা মসৃণতায় ফুটে ওঠে যে, এর অন্তস্তলে বঞ্চনার তীক্ষ্ণতাটুকু যায় লুপ্ত হ'য়ে। পরম হরষে ঐ আমসত্ত, মিহিচাল আর আপ্তবাক্যের স্বাদে, তারা অবোধের মতো বুঝে যায়, উৎপাদন করাটাই তাদের কাজ, ভোগের অধিকার শুধু সামন্ত প্রভুদের। ঐতিহাসিক কারণেই এই সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। তারাশঙ্কর যখন লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন ভারতবর্ষে এইসব ভাগ্যহতদের বিশ্বাসের ঘোর সবে বিঘ্নিত হ'তে শুরু করেছে। তারাশঙ্কর ইংরেজের উপনিবেশ ভারতবর্ষে সেই পরিবর্তন নিরীক্ষণ করেছেন রীতিমতো উৎসাহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে। কারণ ঐতিহাসিক নিয়মে ফিউডালইজম-এর পরেই ক্যাপিটালইজম্-এর যাত্রা সুরু। ভারতবর্ষ নামক ইংরেজ উপনিবেশে ধনতান্ত্রিক শক্তির বিকাশটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। শুধু তাই নয়, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সেই খিন্ন আবির্ভাব যে বিকৃতমূর্তিতে দেখা দিয়েছিল, তাতে শঙ্কিত হবার সমূহ কারণ ছিল।

কোনো স্বাধীন দেশে, পরিবর্তনের সূত্রে, সামন্ততন্ত্রকে সরিয়ে যখন ধন-তান্ত্রিক সভ্যতা তথা সমাজব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে থাকে তখন ধন-তান্ত্রিকতার কুশ্রীতা আর শোষণের মধ্যে বিপর্যয়কর, নির্মম, কঠিন অথচ সবল শক্তির একটা রূপও আত্মপ্রকাশ করে। ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়: "Th[e] bourgeoisie, during its rule of scarce one hundred years, ha[s] created more massive and more colossal productive force[s] than have all the preceeding generations together. Subjectio[n] of Nature's forces to man, machinery, application o[f] chemistry to industry and agriculture, steam navigation, railways, electric telegraphs, clearing of whole continents fo[r]

cultivation, canalisation of rivers, whole populations conjured out of ground—what earlier century had even a presentiment that such productive forces slumbered in the lap of social labour"? ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের যা কিছু গুরুত্ব তা কেবল উৎপাদনের সহায়ক শ্রমশক্তির আধার হিসেবে। সুতরাং দেখা যায়: "The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto honoured and looked up to with reverent awe. It has converted the physieian, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage-labourers". শুধু সামাজিক সম্পর্কগুলিই শেষ হয়ে যায় তাই-ই নয়, একই সূত্রে বিনষ্ট হ'তে থাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজনির্ণীত পারিবারিক যোগাযোগের সূত্রাবলী: "The bourgeois clap-trap about the family and education, about the hallowed co-relation of parent and child, becomes all the more disgusting, the more, by the action of Modern Industry, all family ties among the proletarians are torn asunder, and their children t ransformed into simple articles of commerce and instruments of labour". যাবতীয় কলুষ বা গ্লানি সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অনিবার্যভাবে বা অপরিহার্যভাবে তার মহৎ সামাজিক ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। প্রথমতঃ উৎপাদন ক্ষমতার আধার হিসেবে মানুষ তার ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পায়, দ্বিতীয়তঃ সম্পর্ক-নিরপেক্ষভাবে মানুষ তার ব্যক্তিগত অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয় আর তৃতীয়তঃ সম্পদের অপর্যাপ্ত সমারোহের কিছু না কিছু ফল বঞ্চিতদের জীবনেও বর্তায়। অতঃপর অধিকতর ফললাভের বাসনায়, নিজের অধিকার ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন মানুষ, ব্যক্তিগতভাবে নয় সমষ্টিগতভাবে নিজেদের শক্তিকে সংহত করার ভাবতে শেখে। এইভাবে সংঘশক্তি তাদের জীবনসত্য তথা জীবনীশক্তির প্রতীক হ'য়ে ওঠে। সেখান থেকে তারা যে শোষণমুক্ত, গ্লানিমুক্ত, মর্যাদাবোধসম্পন্ন জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করে, তাকে আর প্রাংশুলভ্য ফলের প্রতি বামনের হাস্যকর বাহু-আন্দোলন ব'লে উপেক্ষা করা ধৃষ্টতা দেখায় না কেউ।

তারাশঙ্করের সামনে যে-সমাজ সত্য ছিল, তার আগাগোড়া কাঠামোটাই

সামন্ততান্ত্রিক—ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের হাওয়া সেই সমাজের এখানে ওখানে ছুঁয়ে গিয়েছে মাত্র। এবং দেশটা যেহেতু তখনও ইংরেজের উপনিবেশ, সেই কারণে ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন ক্ষমতার বলিষ্ঠতা এবং ঐশ্বর্যের সমারোহের দীপ্তি সে সমাজে ততটা স্পষ্ট নয়, উপনিবেশ ব'লেই তার কুশ্রীতার দিকটা যত বেশি মাত্রায় এবং প্রত্যক্ষভাবে সেখানে ফুটে উঠেছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে শিল্পপতিদের উদ্যোগ, দেখা যায়, প্রধানতঃ কয়লাখনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং আমাদের অর্থনৈতিক তথা শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পপতিদের ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য। স্বাধীন দেশ হিসেবে, ভারতবর্ষে যদি ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটত, ভারতীয় শিল্পপতিদের উদ্যোগের সঙ্গে বিজ্ঞান, কারিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্বাধীন সংযোগ ঘটত, তা হ'লে তথাকথিত নীচ বা অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন, বাকি জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একযোগে প্রভাবিত হ'তে পারত। কিন্তু ভারতবর্ষ নামক উপনিবেশে তা হয় নি ব'লেই, এই পরিবর্তন তারাশঙ্করের কাছে কোনো উজ্জীবনের ভূমিকা নিয়ে আসেনি—আসলে এমন কোনো উজ্জীবনের ভূমিকা সেদিন দেশের মাটিতেই সত্য ছিল না। বরং তারাশঙ্কর রীতিমতো সন্ত্রস্ত বোধ করেছেন, কারণ এতদিন সামন্ত-প্রভুরা তাদের আশ্রিত এইসব কাহার, বাউরী, বাগ্দীদের যেটুকু প্রাণের স্পর্শ দিয়ে আসছিলেন, নতুন পরিবর্তনে তা-ও উবে যায়—বনওয়ারীর এতকালের মনিব ঘোষেরা তার ভাগের জমি ছাড়িয়ে নেয়। অতঃপর তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের মৌনমূক মানুষেরা যদি তাদের সামন্তকেই আঁকড়ে থাকতে চায়, তা হ'লে সেই বোধটুকু সত্যিই যে তাদের জীবন-সংলগ্ন, একথা অস্বীকার করাটা কি খুব ন্যায়সঙ্গত হবে?

নতুনকালের প্রতিনিধি করালী, সেই বা কোন্ আশার পথ দেখায়? এটা ঠিক, করালী, কাহারদের অভ্যস্ত জীবনচর্যার আড়ালে যে শোচনীয়তা আছে, তাকে নির্মমভাবে প্রকাশ করেছে; বড় রুক্ষ প্রশ্ন তার: "জাত কার আছে? কোন্ বেটার কোন্ বাবার আছে এখানে?…লজ্জাও নাই তোমাদের। সদ্জাতের—ভদ্রলোকের পা চেটে পড়ে থাক, তারা তোমাদের জাতে মারে, জাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ করে মুখ বুজে সহ্য কর।…কুলকম্ম! কুলকম্ম তো জাঙলের চাষীদের মান্দেরী কৃষাণি রাখালি? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যো যাবা! পেটে ভাত জোটেনা, পরনে কাপড়

জোটেনা।…তুমি মাতব্বর গুছিয়ে নিয়েছ, জমি করেছ, ধান বেঁধেছ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ। লজ্জা! বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই? মাতব্বর! লোকে গতরে খেটে পেট ভরে খাবার মত পরবার মত রোজগার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও! কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে"? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হয়, এই তবে-নতুন কালের শানিত রূপ! যা প্রাচীন অর্থহীন বিচার-বিবেচনাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে! যুক্তির পথে একালের মানুষকে চিরাচরিত বিশ্বাস এবং নির্ভরতার জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের কর্মক্ষমতায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে! ঐ কল-কারখানার শ্রমিক জীবনেই আছে তাদের নিত্য অবমাননা, নিত্য বুভুক্ষা থেকে পরিত্রাণের পথ! কিন্তু পরে পরেই যখন জানা যায় করালীর নামে চুরির নালিশ করে পাখী নিজে, জানা যায় মদের নেশায় সে সমান বেসামাল হয়, দেখা যায় শুধু পাখী নয় অন্য মেয়েমানুষের প্রতিও সে উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে লালসাপরায়ণ এবং রক্তের তেজে আর রোজগারের গরমে সে অসুস্থ বনওয়ারীকে ফেলে তারই দ্বিতীয় পক্ষ সুবাসীকে নিয়ে উধাও হয়, তখন কি মনে হয়না ঐ করালীকে আশ্রয় করে কাহারপাড়ার 'হিতমঙ্গলে'র কথা ভাবাটা বনওয়ারীর পক্ষে ভুলই হয়েছিল? আর এ কথা তো জানাই আছে কল-কারখানা আর খনির মালিক শ্রমিকের শ্রমের মূল্য দেয় বটে, পরিবর্তে তার শ্রম-ই মাত্র নেয়না, সেইসঙ্গে নেয় তার স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, আয়ু এবং মনুষ্যত্বের যা কিছু বৈভব। ঘোষদের বাগানবাড়ীতে অভিসারের শেষে বসন তার হাঁসুলীধারের ঘরে ফিরে আসত, কিন্তু নতুন সভ্যতার সৃষ্টি, নাম না জানা শ্রমিকের টানে করালীর মা কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়; কালোশশীর ঠমকে মুগ্ধ বনওয়ারী শেষ পর্যন্ত সামাজিক বিধানকে মান্য ক'রে গোপনতার একটা আবরণ টানতে বাধ্য হয় অন্ততঃ, কিন্তু সুবাসীকে লোপাট ক'রে করালী সেই আচরিত জীবন ধর্মকেই লঙ্ঘন করে। অথচ নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে করালী যে ঠিক অবহিত এবং দ্বিধাহীন তেমন কথাও ভাবা যায়না। করালীর মধ্য দিয়ে প্রাচীন মূল্যবোধকে আঘাত করাটাও সম্পূর্ণ নয়, তা হ'লে আধুনিকতার প্রতিবন্ধক বনওয়ারীর মৃত্যুর পরে সে বনওয়ারীর স্বর্গকামনায় শালকাঠের চিতাশয্যা রচনা থেকে নিবৃত্ত থাকত। আর করালীর অনুসারী হাঁসুলীবাঁকের সেই তরুণ কাহার ছেলেরা? বনওয়ারীর নিষেধ অমান্য ক'রে যারা 'চন্ননপুরের' কলের শ্রমিকে পরিণত, তারাও কেন "চন্ননপুরের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্স থেকেও তাকায় বালিভরা

ওই হাঁসুলীবাঁকের দিকে"? করালী বা তার অনুচরদের এই ধরনের আচরণের অর্থ একটাই—হাঁসুলীবাঁকের জীবনে যাবতীয় অসম্মান সত্বেও মাটি ছিল তাদের পায়ের নীচে, সেখানে অধঃপতিত সেই জীবনের ফাঁকে ফাঁকে তারা পেত কিছু উষ্ণ স্পর্শ। পরিবর্তিত জীবনে অসম্মানের বোঝটা হাল্কা হয়নি তেমন, বরং সংশয়ে পীড়িত হ'তে হ'তে, বিপর্যস্ত মন নিয়ে তারা হারানো সজীবতার সন্ধানে ফেরে, অর্ঘ্য দিয়ে বসে পুরনো মূল্যবোধকেই। ধনতন্ত্রের স্পর্ধিত অভিযান তাদের চোখে সামন্ততন্ত্রের মন্থরতাকে, নিষ্ক্রিয়তাকে তেমনভাবে মেলে ধরে নি। আবার ধনতন্ত্রের শোষণের পরিণামটা বুঝে নিয়ে, নিজেদের সংগ্রামী ভূমিকার কথাও তাদের মনে আসেনা। সুতরাং তারাশঙ্কর যদি এই রুগ্ন ধনতন্ত্র (Sick Capitalism) এবং তার শীর্ণ প্রতিনিধি করালীর উপর শেষ পর্যন্ত আস্থা হারিয়েই থাকেন, তবে সেটা তাঁর ইতিহাসসম্মত বিবেচনা ব'লেই গণ্য করা উচিত। এই পরিবর্তনে কিছু চমক আছে বড়জোর, নতুন কোনো মূল্যবোধের সন্ধান সেখানে অনুপস্থিত।

কূট তর্ক তোলা যায় অবশ্য। ইতিহাসের পদক্ষেপ, সামাজিক রূপান্তর—সব কিছুকে তারাশঙ্কর যদি তাঁর বুদ্ধির সামর্থ্যেই বুঝে থাকেন, তবে করালীর মতো একটি অপুষ্ট চরিত্রকে কেন তিনি বনওয়ারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত করলেন? তার থেকে সবল কোনো চরিত্রকে তিনি কালের প্রতিভূ-রূপে আঁকতেও পারতেন। হয়তো পারতেন, তবে সে চরিত্র সত্য হ'ত কিনা সে-বিষয়ে কি নিঃসংশয় হওয়া যায়? কারণ করালীর থেকে বলিষ্ঠ কোনো চরিত্র তখনকার আধুনিকতার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তো বটেই, দ্বিতীয়ার্ধের এই শেষের লগ্নেও আমাদের সমাজ মূলতঃ সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথা প্রকরণ ও বিশ্বাসবোধের অনেক কাছাকাছি। আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন এখনও এমন পরিণতি লাভ করে নি, যা থেকে সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব। এবং সেটা যতদিন সম্ভব না হবে, ততদিন লাঞ্ছিত-নিপীড়িতের জয়যাত্রার ছবি অলীক ব'লে মনে হবে। তারাশঙ্কর একা নন, বাঙলা কথা সাহিত্যের শিল্পীরা তাদের সমবেত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই ধারণাটাকেই প্রামাণ্য ব'লে তুলে ধরেছেন। এইজন্যে, বাঙলা উপন্যাসে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভের ছবি আছে এখানে ওখানে, কোনো সামগ্রিক সমাজ-বিপ্লবের আয়োজন নেই কোথাও।

অথচ দেখা যায়, তারাশঙ্করকে নিয়েই ক্ষোভটা একটু বেশি মাত্রাতেই

Scanned by TapScanner

অভিনব অভিজ্ঞতা।

চতুরঙ্গ বাংলায় প্রথম সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস। এখানে ঘটনা গৌণ, সমাজ অপ্রধান, পরিচিত পরিবেশ অনুপস্থিত। ঘটনা ও চরিত্রের সংখ্যাল্পতা ও ব্যক্তিচরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠা বড় কথা। শচীশের জীবনসাধনার চতুর্থ ছকে ব্যক্তিচরিত্র সর্বময় পূর্ণতা পেয়েছে। উপন্যাসে এখন আর কেউ নেই, আছে কেবল শচীশ আর তার সাধনা। তাই শচীশ দামিনীকে বলে, "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।"

সংসারের কাছে শচীশের এই শেষ কথা। শচীশ ও তার অসীমের সাধনার মাঝে আর কেউ নেই। আধুনিক ভাষায় বলা যায়, শচীশের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-উদ্‌ঘাটনের সাধনায় সে একা। তার নিঃসঙ্গ সাধনার পথে শচীশ একে একে সব ছেড়েছে, পরীক্ষা করতে করতে এগিয়েছে। প্রচলিত নাস্তিকতা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসে, যুক্তিনির্ভর পজিটিভিজম্ থেকে ভক্তিনির্ভর বৈষ্ণবতার পথে পথিক শচীশ। কিন্তু সেখানেই থেমে যায়নি। জীবনসাধনায় রসের মূল্য স্বীকার করেছে, দামিনীকে গুরু বলে মেনেছে। এখানেও সে স্থিত হল না, আরো এগিয়েছে, জীবনের সত্যকে দেখার জন্য সে অন্তর-পথে, দুরূহের পথে, নিঃসঙ্গ একাকিত্বের পথে আত্মনির্ভর হয়ে এগিয়েছে। বলা যেতে পারে, চরিত্রের বিবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা শচীশেরর মধ্যে চূড়ান্ত গতিবেগ লাভ করেছে। শচীশ এক নয়, অনেক। অনেকবার শচীশের জন্ম ও মৃত্যু ঘটেছে। ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর ফুলে নানা শচীশের একখানি মালা রবীন্দ্রনাথ গেঁথেছেন।

এই মালা তার প্রাপ্য বলে যে ভেবেছিল সে-ই দামিনী শেষ পর্যন্ত তা পায়নি। শচীশকে তার পাওয়া হয় নি। শচীশ দামিনীর মুক্তি, তার আকাশ, তার পরিণামী সমুদ্র। কিন্তু আকাশকে ব্যক্তির সীমার মধ্যে ধরা যায় না। এখানেই দামিনীর ভুল হয়েছিল। শচীশ-প্রত্যাখ্যাত দামিনী মাটির পৃথিবীতে ফিরেছে, বাস্তবকে আশ্রয় করতে চেয়েছে, তাই শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে। শচীশ হল আগুন, তাকে নিয়ে ঘরকন্না চলে না,—একথা যেদিন দামিনী বুঝেছে, সেদিন শচীশের পথ থেকে নিজেই সরে গেছে। কিন্তু সেই প্রলয়াগ্নির পরশমণি দামিনী ছুঁয়েছে, সেই দাহনেই তার মৃত্যু। দামিনীর দুটি স্বীকারোক্তি স্মরণীয়। দামিনী শ্রীবিলাসকে নিজের সম্পর্কে বলেছে—"সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে—" একথা বলতে বলতে দামিনী নিজের বুকে দম্‌দম্ করে কিল মেরেছে। এ হল দামিনীর আত্মদহন। তার দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি, তার বুকের ব্যথার মূল্যে ক্রীত আনন্দ। গুহা থেকে ফিরে আসার পর থেকে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হয়েছিল। শ্রীবিলাসকে বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে যখন ব্যথার বাড়াবাড়ি হল তখন দামিনী বলল, "এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি।" দামিনীর এই স্বীকারোক্তি আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ বলেই গৃহীত হবে।

সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাসের প্রায় সব ক'টি লক্ষণ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বর্তমান। সেদিন—১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে—রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কথাসাহিত্যক্ষেত্রে যে সুবিপুল শিল্প-সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তার ব্যবহার সেদিন হয়নি। ঐ বৎসরে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'। সন্দেহ নেই, 'চতুরঙ্গে'র শিল্প-সম্ভাবনা শরৎচন্দ্রকে প্রাণিত করেনি। বাংলা উপন্যাসে শিল্প-সম্ভাবনার সফল অনুসৃতি হয়েছে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে

... আবিষ্কারের পথে চরিত্রের উত্তরণ, চরিত্রের নিঃশর্ত, স্বাধীন বিবর্তন, চরিত্রের ব্যক্তিবিশেষত্বের প্রতিষ্ঠা, প্রতিদিনের নির্মিত ও নির্মীয়মাণ চরিত্রের উপর অন্ধকার অবচেতনার প্রভাব, অ-সম্পূর্ণ অ-নির্ধারিত চরিত্রের নিরন্তর পূর্ণতার অন্বেষণ—সবকিছুরই ইঙ্গিত 'চতুরঙ্গে' আছে। বাংলা উপন্যাসে পূর্ণতার অন্বেষণ ও ব্যক্তিচরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠার সূচনা রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'। তাই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্বরূপ-সন্ধানপথে চতুরঙ্গের শিল্প মূল্যবিচার সৎবিবেকী উপন্যাসপাঠকের অবশ্যকর্তব্য।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে সঞ্চার করেছেন এক নতুন আত্মবিশ্বাস, এক নতুন শিল্পচেতনা, যার ফলে রিয়ালিটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে যায়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে এই নতুন আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করে সিবিল স্মিথ যে কথা বলেছেন, তা আধুনিক বাংলা উপন্যাসপাঠের প্রেক্ষাপট হতে পারে :

> The contemporatry novelist has a new confidence in his fiction, the expression of an awareness which has been developing slowly since the beginning of the century that the reality of his art does not depend on, and therefore need not try to legitimize itself by, approximation to actuality. He no longer disguises fictitiousness as possibility, but exploits his right to invent—not as a sign of his artistic sovereignty but for the purpose of showing reality.

২. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

২.১ ॥ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৯৮—১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) আমাদের অস্থির সংশয়-বিক্ষুব্ধ অবিশ্বাসী যুগের প্রধান কথাশিল্পী। তাঁর রচনাকাল পঁয়তাল্লিশ বৎসর (১৯২৬-১৯৭১) ব্যাপ্ত। বস্তুত এই অল্পবিস্তর অর্ধ শতাব্দী আধুনিক ভারতবর্ষের জীবনে যুগান্তরের কাল। পুরনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অবসান, নতুন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের অভ্যুদয় ঘটেছে এই কালে। এই অর্ধ-শতাব্দীর সমস্ত তরঙ্গ বিক্ষোভ তারাশংকরের গল্প-উপন্যাসকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা লেখক গ্রস্ত হন নি, এক অবিনাশী ভারতচেতনা ও শান্ত স্থিতধী সংশয়মুক্ত জীবনবোধে তিনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে তারাশংকর কখনো বিচ্যুত হন নি বলেই অনেক পরিবর্তনের ঝড়-ঝাপ্‌টা পেরিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন, যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী হতে পেরেছেন।

অথচ এ কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে তারাশংকরের সহযাত্রী-লেখকদের তুলনায় তাঁর শিল্প-উপাদান ও কারয়িত্রী-প্রতিভার কারুকর্ম উঁচুদরের ছিল না, বরং হীনতর ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের তীক্ষ্ণধী ও সংকেতগূঢ় ভাষা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৃদয়ের জটিলতায় বিচরণনৈপুণ্য ও তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরল শিল্পসততা ও অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন প্রকৃতিবোধ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রবোধকুমার সান্যালের ভাষায় উজ্জ্বল প্রসাধন, বুদ্ধদেব বসু ও অন্নদাশংকর রায়ের বৈদগ্ধ্য, বনফুলের বিচিত্র উদ্ভাবনশক্তি ও সৃষ্টিবৈচিত্র্য : সব-কিছুতেই

তারাশংকর ন্যূন ছিলেন। তবু ধীরে ধীরে রাঢ়ের 'গাঁইয়া' লোকটি
বিস্তার করেছেন। তাঁর পদক্ষেপ নির্ভুল, আত্মশক্তিনির্ভর, জীবননিষ্ঠ।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'রসকলি' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়। 'কল্লোলে' তাঁর আরো গল্প প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখক নন। ঐ গোষ্ঠীর তিনি প্রতিষ্ঠাতৃদের অন্যতম নন। বীরভূমের অখ্যাত গ্রাম থেকে ডাকে গল্প পাঠিয়েছিলেন 'কল্লোলে', সাহিত্যের জহুরী শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তা পড়ে তাঁকে লেখেন—'এতদিন কোথায় ছিলেন?' কল্লোল-গোষ্ঠীর কৃতিত্ব এইখানে যে, তাঁরা তারাশংকরকে গ্রাম থেকে কল্লোলিত কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু তারাশংকর পুরোপুরি 'কল্লোলে'র নন, তার কারণ তিনি নাগরিক লেখক নন। কল্লোল-গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের নাগরিক বৈদগ্ধ্য, উচ্চ শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্যমুখীনতা, আপাত-বিদ্রোহী রোমান্টিকতা সম্বল করে তিনি লিখতে শুরু করেন নি। তিনি সোজাসুজি মাটি ও মানুষকে নিয়ে লিখতে শুরু করেন। এই জন্য তাঁকে কখনও উপাদান খুঁজে বেড়াতে হয় নি। বীরভূমের গ্রামে যে পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, সেই পরিবেশকেই—মানুষ ও প্রকৃতিকে—গল্প উপন্যাসে ধরে নিয়েছিলেন। তিনি যে নাগরিক লেখক নন, গ্রাম-জনপদের লেখক, তাঁর দীর্ঘ রচনাতালিকাতেই তা প্রমাণিত হয়। 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), 'ঝড় ও ঝরাপাতা' (১৯৪৬) শিল্পসৃষ্টি হিসাবে ব্যর্থ, কারণ তারাশংকরের মনোযোগ তাতে আছে, অন্তরের যোগ নেই। যেখানে তিনি মাটির প্রতি, ভারতের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনুগত এবং মানুষের প্রতি, রাঢ়-জনপদের উচ্চ নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও আদিবাসীদের প্রতি মমতাশীল, সেখানেই তাঁর নিঃসংশয় সাফল্য। যখনি তাঁর বাইরে গেছেন তখনি তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আসল কথা তারাশংকর তাঁর শিল্প-অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সফল। বহুকাল ধরে কলকাতায় বাস করলেও তিনি নগরজীবনের শিল্পী নন, গ্রাম-জনপদের রূপকার, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। এই কারণেই চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৫৩), পঞ্চপুত্তলী (১৯৫৬), রাধা (১৯৫৭) তারাশংকরের প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস। পাপ-পুণ্য, অস্তি-নাস্তির দোলায় দোলায়িত হয়েছেন যে দুটি উপন্যাসে—বিচারক (১৯৫৭) ও সপ্তপদী (১৯৫৭) সেখানেও তারাশংকর ভারতের ধর্মবিশ্বাসের পটভূমিতে উত্তর সন্ধান করেছেন, পাশ্চাত্ত্য জগতের ব্যক্তিত্বের সংকটের আবর্তে পড়েন নি। এবং শেষ দুটি নভেলেটে ('সুতপার তপস্যা' ও 'একটি কালো মেয়ে'—একযোগে '১৯৭১' নামে প্রকাশিত) তিনি বর্তমানের বিক্ষুব্ধ পটভূমিতে যে আশ্রয় অন্বেষণ করেছেন, তা একালের পশ্চিমী দুনিয়ার ব্যক্তির সংকটাবর্ত-উত্তরণের প্রয়াসে নয়, ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসের বেদীমূলে। তারাশংকরের শ্রদ্ধা ছিল 'গণদেবতা'য়, কিন্তু তাঁর আত্মসমর্পণ অন্তর্দেবতার কাছে।

নিঃসন্দেহে তারাশংকর সাম্প্রতিক কথাশিল্পী নন। সম্প্রতিকালের সংশয় অবিশ্বাস চাঞ্চল্য অশ্রদ্ধাকে তিনি কখনই বড় করে দেখেন নি। এ কারণে তাঁকে এই মুহূর্তে একটু অচেনা মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি আধুনিক লেখক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দে যেসব গুরু সামাজিক রাজনীতিক আর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলে অচলায়তন সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে, তিনি সেই পরিবর্তনের, সেই যুগান্তরের শিল্পী; এখানেই তিনি আধুনিক।

২.২ ॥ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ। জন্ম উনিশ শতকের শেষ বিন্দুতে (১৮৯৮), মৃত্যু সাম্প্রতিক অস্থির মুহূর্তে (১৯৭১)। 'আমার কালের কথা' (১৯৫১)

ও 'আমার সাহিত্য জীবন' (দুখণ্ড ১৯৫৩, ১৯৬২) গ্রন্থে স্মৃতিচারণায় তিনি যে দেশ কালের কথা বলেছেন তা আমাদের কাছে প্রায় রূপকথা-সুলভ দূরত্বে অবস্থিত। সেই স্বাদেশিকতার প্রত্যুষ ও রাখীবন্ধনের সোনালি দিন,—সেখান থেকে তাঁর যাত্রা শুরু। বিপ্লববাদী আন্দোলন (১৯০৭-১০), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), সাম্যবাদী আন্দোলনের সূচনা (১৯২৭-২৮), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১), বিয়াল্লিশের সংগ্রাম (১৯৪২), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ (১৯৪৭), পূর্বপাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) ও পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের অভ্যুদয় (১৯৭১)—সবই তিনি দেখে যেতে পেরেছেন।

তারাশংকরের শিল্পিমানসের উপাদান অন্বেষণ করতে গিয়ে তাই আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে, স্বদেশচেতনার প্রত্যূষে।

তারাশংকরের কথায় ১৯০৫ সালের ছবি,—

"এল আমার কালের নতুন কাল। শহরে হয়ত এর আগেই আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তখন একালের আরম্ভ।

মনে পড়ছে ভোর হতে না হতে ডাক এসেছে।

—নির্মল।

—কে? গোপাল?

—হ্যাঁ, উঠে আয়।

—আসছি।

—আয়। আমরা আর সবাইকে ডাকতে যাচ্ছি।

—ষষ্ঠী—।

—ষষ্ঠী তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফোড়নকে ডাকতে গেছে।

—সুধীর।

—সুধীর? সে তো কালীকিঙ্করের বাড়িতে।

—রজনী।

—রজনী তো সুধীরের সঙ্গে কালীকিঙ্করের বাড়িতে গেল।

—কালীকিঙ্কর।

—যাচ্ছি আমরা।

এ পাড়া থেকে ও পাড়া। ও পাড়া পেরিয়ে বাজার পাড়া। বাজার পাড়া পেরিয়ে স্কুল-বোর্ডিং। সমবেত কণ্ঠে শুধু ধ্বনিত হচ্ছে একটি ডাক—বন্দে মাতরম্।" (আমার কালের কথা)

শিশু তারাশংকরের মানসিকতা এই পটভূমিতে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে তারাশংকরের জন্মধাত্রী বীরভূমের লাভপুর গ্রাম তারাশংকর-মানস গঠনে সহায়তা করেছে। তাঁর নিজের কথায়—

"লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত।...কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না।...১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদারপ্রধান গ্রাম।...লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহে প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ!" (আমার কালের কথা)

Scanned by TapScanner

তারাশংকর দেখেছেন দুটি দিক, এ... প্রাচীনকালের শিক্ষা ও আভিজাত্য সম্পন্ন পরিবার’ অন্যদিকে ‘সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থসম্পন্ন ধনী পরিবার’। এই লড়াইয়ে জমিদারশ্রেণীর পরাভব ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিজয়, গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পরাজয় ও শিল্পকেন্দ্রিক শহুরে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা তারাশংকর কৈশোরযৌবনে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর উপন্যাসে এই দুই শ্রেণীর অনিবার্য দ্বন্দ্ব ও পরিণাম চিত্রিত হয়েছে। ‘কালিন্দী’ (১৯৪০), ‘পঞ্চগ্রাম’ (১৯৪৪) তার পরিচয়স্থল। তারাশংকর লুপ্তগৌরব জমিদারবংশের সন্তান। তাঁদের জমিদারির বার্ষিক আয় ছিল মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। সেই জমিদারির আভিজাত্য, গর্ব, দম্ভ কেবল এদুটি উপন্যাসেই নয়, তার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘ধাত্রীদেবতা’য় (১৯৩৯) চিত্রিত। শোণিতসম্পর্কে তিনি জমিদারশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। তাই এই বিলীয়মান শ্রেণীর প্রতি তাঁর মমতা গল্প-উপন্যাসে প্রকাশিত। এই সকরুণ মমতা চমৎকার শিল্পরূপ পেয়েছে ‘সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার’ গল্পে।

কিন্তু তারাশংকরের শিল্পিমানস ভেঙে-পড়া জমিদার শ্রেণী ও নব্য-অভ্যুদিত ব্যবসায়ীশ্রেণী, দুয়ের কোনোটিকেই শেষপর্যন্ত বড়ো করে তুলে ধরেননি। তা করলে তিনি আধুনিক চিন্তার পথিক হতে পারতেন না, আধুনিক কালের জীবনশিল্পী হতে পারতেন না। তাঁর নিজস্বতা প্রথম প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চৈতালী ঘূর্ণি’তে (১৯৩১)। ‘উপাসনা’ পত্রিকায় এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময়েই আঞ্চলিক উপন্যাসের এক বিস্ময়কর নবরূপ হিসেবে, জনপদজীবনের আলেখ্য রূপে, এমনকি ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-অতিক্রমী মানবজীবনধারার কাহিনী রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটি তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ, ‘ত্রিপত্র’ কাব্য বাদ দিলে প্রথম গ্রন্থ,—পরবর্তী সকল বৃহৎ উপন্যাসের সূচনা। কর্তব্য, তারাশংকরের উপন্যাসসংখ্যা ৬০। শেষ উপন্যাস ‘নবদিগন্ত’ (প্রকাশ : ১৯৭৩)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,—

> তারাশংকর সাহিত্যজীবনে রাঢ়ের গ্রামাঞ্চল নিয়ে বহু সার্থক ও সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু সে সমস্ত উপন্যাসের প্রায় তাবৎ উপাদানই বীজাকারে যেন তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার ‘চৈতালী ঘূর্ণি’র মধ্যেই সঞ্চিত।...এই ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ শুধু এই যে, সাহিত্যকার হিসেবে তারাশংকর সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম সোপানে পা রাখার সময় থেকেই নিজের সাহিত্য-লক্ষ্য সম্বন্ধে যেন প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন এইটুকু দেখানো। (‘তারাশংকর’, ‘দেশ’ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সংখ্যা)।

রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির সাধনা তারাশংকরের জীবনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কলকাতায় সেন্ট জেভিয়র্স কলেজে আই. এ. পড়ার সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। সেই অপরাধে তিনি নিজের গ্রামে অন্তরীণ ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা পরে কাজে লেগেছিল, ডেটিন্যু যতীন (গণদেবতা) তার প্রমাণ। তারপর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মীরূপে বীরভূমের গ্রামে শহরে কাজ করে বেড়িয়েছেন। এসময়ে আকস্মিকভাবে তাঁর হাতে পৌঁছয় ‘কালি-কলম’ পত্রিকার দুটি সংখ্যা (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৯২৬)—এই দু সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘জোহানের বিহা’, ও প্রেমেন্দ্র মিত্রর ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’। গল্পলেখার একটি নতুন পথের সন্ধান তিনি পেলেন, তার ফলে লিখলেন ‘রসকলি’ গল্প (১৯২৬)। (বলা উচিত তিনি আগে পড়েন জ্যৈষ্ঠ ...

‘রসকলি’র বৈষ্ণবীকে তিনি তাঁর জমিদার মহালেই পেয়েছেন, বীরভূমের গ্রামেই তাঁকে আবিষ্কার করেছেন। তারাশংকর তাই অভিজ্ঞতার শিল্পী। স্কান্ডিনিভীয় বা ইংরাজী বা ফরাসী সাহিত্য থেকে তিনি প্রেরণা পান নি, পেয়েছিলেন বীরভূমের গ্রামজীবন থেকে।

প্রথম উপন্যাস ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ (১৯৩১)-তে মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রধান দুই শ্রেণী জমিদার ও ব্যবসায়ীর সংঘর্ষ এতে যেমন চিত্রিত, নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভূভাগ আর খণ্ডকাল নিয়ে তেমনি চিত্রিত দেশকাল আলিঙ্গিত মানবজীবনধারা।

এর পরই তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরূপে দু বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন (১৯২৮-৩১)। সাহিত্য ক্ষেত্রে পাঁচবছর (১৯২৮-৩৩) তাঁর কোনো সাড়া নেই। এই পাঁচ বছর লেখক হিসেবে তাঁর প্রস্তুতির কাল। কংগ্রেস কর্মী রূপে দেশকে খুব কাছের থেকে দেখেছেন, জমিদার বংশের জামাতারূপে ধনতান্ত্রিক দাম্ভিকতার আঁচ পেয়েছেন, গ্রামের সন্তানরূপে মাটি ও মানুষকে ভালবেসেছেন, শাক্ত-বৈষ্ণবের ক্ষেত্র রুক্ষ উদাস লালমাটির দেশকে জেনেছেন, ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাত-বৈষ্ণব ও বৈরাগীদের চিনেছেন, বেদে-পটুয়া-মালাকার-লাঠিয়াল-চৌকিদার-ডাকহরকরা-কবিয়াল-সাপুড়ে-দরবেশ কতো বিচিত্র মানুষকে জেনেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হল কারাজীবনের অভিজ্ঞতা। সাহিত্যক্ষেত্রে পাঁচ বছর (১৯২৮-৩৩) বাদে যখন তারাশংকর দেখা দিলেন, তখন তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন।

পর পর প্রকাশিত হল ‘নীলকণ্ঠ’, ‘পাষাণপুরী’, ‘রাইকমল’, ‘ছলনাময়ী’, ‘প্রেম ও প্রয়োজন’, ‘আগুন’, ‘জলসাঘর’, ‘রসকলি’ (১৯৩৩-১৯৩৮)। তারাশংকর বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আসনে হলেন সুপ্রতিষ্ঠ, স্ব-প্রতিষ্ঠ। তারপর লিখলেন ‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯) ও ‘কালিন্দী’ (১৯৪০)। শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের অধিনায়কত্বে তারাশংকরের দাবি সর্বপেক্ষা অধিক, তা এই সময় প্রতিষ্ঠিত হল। তা সমর্থিত হল ‘গণদেবতা’ (১৯৪২) ও ‘পঞ্চগ্রাম’ (১৯৪৪) উপন্যাসে।

এসময়েই তারাশংকর এক অভিভাষণে বলেছিলেন :

> আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি, তা সুস্পষ্টভাবে সেকালের সাহিত্যের বক্তব্য থেকে পৃথক। তাঁরা দৃষ্টির যে কোণ থেকে এদেশের মানুষের অন্তরের অসন্তোষ দেখেছিলেন এবং কারণ নির্ণয় করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।...সকলেরই সুর ছিল প্রায় এক। তার অধিকাংশ স্থলেই—যারে চাই তারে কেন পাই না, এই অতৃপ্তির সুর ছিল উগ্র এবং সমাজের বিরুদ্ধে তার এই সম্পর্কিত সকল বিধির বিরুদ্ধে আক্রোশ, ক্ষেত্রবিশেষে ছিল বিদ্রোহ।...আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে, অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। ‘চৈতালী ঘূর্ণি’তে আমি তা প্রথম বলতে চেষ্টা করেছিলাম।...‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কালিন্দী’তে নতুন করে সেই কথা বলে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।...রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা। জীবন-মুক্তি বলতে ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি, অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। সেই তার অভিযান।...সে সময়ের রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি সংগ্রামকে অনুভব করেছিলাম আমি। (বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে

অভিভাষণ, ১৯৪২)।

মনে হয়, 'সনাতন 'জীবন-মুক্তির সাধনা' বলতে তারাশংকর এক ধ্রুব আদর্শের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষের লক্ষ্য শুধু দেশের রাজনৈতিক মুক্তি বা আর্থনীতিক উন্নতি নয়, তার লক্ষ্য 'জীবন-মুক্তি', ভয় থেকে, হীনতা থেকে, দীনতা থেকে মুক্তি। তাঁর লক্ষ্য নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক ; শূন্যতাবাদ নয়, আস্তিক্যবোধ।

২.৩ ॥ শরৎচন্দ্র-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের নেতৃস্থানীয় লেখক তারাশংকর। কোন্ গুণে তিনি এই গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানেই তারাশংকরের ভূমিকাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬)-এর নায়ক রমেশ আর তারাশংকরের 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪২-৪৪)-এর নায়ক দেবু ঘোষ, ও দুজনের জীবনদৃষ্টির তুলনামূলক বিচারে অনুধাবন করা যায় তারাশংকর শরৎচন্দ্র থেকে কী নিয়েছেন, নিজস্ব কতটা দিয়েছেন। 'পল্লীসমাজে'র পটভূমি সংকীর্ণ, গ্রাম্য দলাদলি, সামাজিক ঘোঁট, স্বার্থপর হীন চক্রান্তের মাঝে রমেশ-রমার প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত। সে প্রেম কোনোদিন আত্মপ্রকাশের সাহস অর্জন করে নি। তার কারণ লেখকের সমাজভীরুতা ও সংস্কারানুগত্য। রমা ও রমেশ গ্রাম্য সামাজিক শাসন ও দলাদলিতে ভীত। হিন্দু সমাজ-অননুমোদিত প্রেমকে স্বীকৃতিদানে লেখকের ভীরুতা দুজনকে মিলতে দেয় নি। শরৎচন্দ্র বৈধব্যের সংস্কার ও সংস্কারের ভয় থেকে রমাকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন নি।

গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের পটভূমি অনেক ব্যাপক বিস্তীর্ণ। এখানেই তারাশংকর শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছেন। দেবু ঘোষ এ দুই উপন্যাসের নায়ক বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজই নায়ক। এখানেই তারাশংকর যথার্থ আধুনিক জীবনশিল্পী, যুগের রূপকার।

ধাত্রীদেবতা ও কালিন্দী-র পরই গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম : পাঁচ বছরের মধ্যে (১৯৩৯-৪৪) এই চারটি উপন্যাসে তারাশংকর কেবল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন না, সেই সঙ্গে বাংলা উপন্যাসকে এক নির্দিষ্ট পথে চালনা করলেন। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটাতে পারেন নি এ কারণে যে তাঁরা শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক ভাবালুতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি! পথের পাঁচালী (১৯২৯) ও পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), এ দুই উপন্যাসের অসাধারণ শিল্প-সমৃদ্ধি সত্ত্বেও শরৎ-পরবর্তী উপন্যাসের দিশারী হতে পারেন নি বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মুহূর্তে তারাশংকর এসে বাংলা উপন্যাসের নব প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। এইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামে তারাশংকর দেখালেন গ্রামীণ সমাজ কী ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক ইনডাসট্রি কী ভাবে সংরক্ষিত গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙে দিচ্ছে, কিভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য মুক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে সমাজ ভেঙে আসতে প্রলুব্ধ করছে, কীভাবে জীবনের গভীরে প্রোথিত শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল আল্‌গা হচ্ছে, তা এখানে চিত্রিত হয়েছে। এই দুর্বার সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবর্তনের তরঙ্গাঘাতে গ্রামীণ সমাজ ধীরে অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে বদলে যাচ্ছে, তার বিশ্বস্ত ছবি এখানে পাই।

তবে কি গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম সামাজিক ভাঙন ও পরিবর্তনের বিশ্বস্ত দলিল মাত্র? না, তার চেয়ে কিছু বেশি। সেখানেই তারাশংকরের স্বকীয়তা। তিনি রাঢ় জনপদের গোটা

জীবনকে—অসংশোধিত রুক্ষ ভয়াল সুন্দর উপাদানগুলিকে—আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। স্কাণ্ডিনেভীয় ও ইংরেজি-ফরাসী উপন্যাসের ভাবানুবাদ নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার রক্তরঞ্জিত জীবনের বড় বড় চাংড়া এনে বসিয়ে দিয়েছেন। কেবল প্রতিমা গড়েন নি, তাতে দিয়েছেন তাজা রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড। শান্ত সরল বিনীত নৃশংস ভয়ংকর কঠিন রাঢ়-জনপদবাসীদের তিনি সোজাসুজি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল—ব্রাহ্মণত্বের প্রতিনিধি মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন, মহিমাভ্রষ্ট অথচ আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট প্রাক্তন জমিদার দ্বারিক চৌধুরী, আভিজাত্যকামী নিষ্ঠুর ছিরু ওরফে শ্রীহরি পাল, অন্তর্জীর্ণ গ্রামসমাজের শাসন-বিরোধী অনিরুদ্ধ কামার, অন্যায়-বিরোধী স্বৈরিণী দুর্গা মুচিনী, অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম কামারনী, রাজবন্দী যতীন, ধনী মুসলমান চাষী দৌলত শেখ, আদর্শবাদী দেবু ঘোষ, ব্রাহ্মণ্য গৌরব-ভ্রষ্ট উপবীতবর্জনকারী ন্যায়রত্ন-পৌত্র বিশ্বনাথ, ইরসাদ, রহম চাচা, জোসেফ নগেন্দ্র রায়—সকলেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। রুক্ষ রাঢ়ভূমি, শ্যামল ধানক্ষেত, ময়ূরাক্ষীর আকস্মিক বান, ঘেঁটুর গান, নবান্ন উৎসবের ঢাকের শব্দ, ঘন আঁধারে ডাকাতের সংকেতধ্বনি—সমস্ত মিলে এক চমৎকার পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

সমাজের ভাঙন, শতাব্দী-সঞ্চিত শাসন ও বিনয়ের অবসান, ব্যক্তির বিদ্রোহ, গ্রামসমাজে ধনের প্রাধান্য, উচ্চবর্ণের মহিমার বিলুপ্তি, আর্থনীতিক স্বনির্ভরতার স্থানে কল-কারখানার শস্তা জিনিসের প্রাবল্যে গ্রাম্যশিল্পীর অসহায়তা ও বিদ্রোহ, জমিদার ধনী চাষীর সঙ্গে গরীব চাষীর লড়াই, করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে পঞ্চগ্রামের চাষীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-সঙ্কল্প ও সে সঙ্কল্পে বিচ্যুতি, প্রবলের কাছে গরীবের আত্মসমর্পণ, আদর্শবাদী নায়ক দেবু ঘোষের নেতৃত্বের প্রতি গরীব চাষীর অনাস্থা, ময়ূরাক্ষীর বানের মুখে অসহায় গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া,—সব মিলিয়ে গোটা গ্রাম জীবনের সামাজিক ও আর্থনীতিক বিপর্যয়, তারই মাঝে গোটা মানুষের অভ্যুদয় বাংলা উপন্যাসের প্রতিমায় নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল।

আমাদের পরিচিত কালের দুর্বার সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন তারাশংকরই প্রথম দেখিয়েছেন। তিনি এই পরিবর্তনের, যুগান্তরের প্রধান শিল্পী। এখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা।

এই ক্ষেত্রে তারাশংকরের সুবিধাটা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। তারাশংকর বীরভূমের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান। সচ্ছল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে তাঁকে ধরা যায়। কিন্তু কখনোই এই সম্প্রদায়ের ছবি আঁকায় খুব একটা উৎসাহবোধ করেন নি। আসলে তাঁর ঝোঁকটা ছিল গ্রামীণ সমাজের দিকে, যে সমাজকে তিনি খুব কাছের থেকে দেখেছেন। তিনি 'আউট সাইডার' নন, 'ইন্‌সাইডার'। গ্রামীণ সমাজের বিচিত্র মানুষ, সামাজিক রীতি সংস্কার বিশ্বাস ও গণজীবনের গভীরে প্রোথিত মূলের সংবাদ তাঁর অজানা ছিল না। একারণেই তাঁর জীবন ও চরিত্র-চিত্রণ সম্পূর্ণ ও সত্য হতে পেরেছে।

অনেকে বলেন, তারাশংকর নিজেও বলেছেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবন, গান্ধীবাদে বিশ্বাস তাঁকে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। একথা গ্রহণযোগ্য নয় দুটি কারণে। প্রথমত, কেবল রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসের দ্বারা কোনো বড় লেখক তৈরী হয় না, তৈরী হয় তাঁর মানবতাবোধে, জীবনের প্রতি মমত্বে। দ্বিতীয়ত, তারাশংকর-চিত্রিত গান্ধীবাদী চরিত্র তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে দুর্বলতম। 'ধাত্রীদেবতা'র (১৯৩৯) গান্ধীবাদী চরিত্র সার্থক নয়, যেমন নয় 'পাষাণপুরী'র (১৯৩৩) রাজনৈতিক চরিত্র।

তারাশংকরকে শরৎ-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের অধিনায়করূপে গড়ে তুলেছে মাটি ও মানুষের প্রতি শিল্পীর মমতা। এই সঙ্গে তারাশংকর ঔপন্যাসিকরূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তাঁর শিল্পদায়িত্বের দ্বারা। পরিবর্তমান যুগের ও সমাজের রূপকার, ইতিহাস-লেখক, ক্রনিক্লার-রূপে তারাশংকর দেখা দিয়েছেন। তার সূচনা 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে (১৯৩১), পরিণতি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় (১৯৫১)—মাঝে আছে 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৩৯-৪৪)। লোকসংস্কৃতির ভিত্তিতে রচিত 'রসকলি' গল্প আর 'কবি' উপন্যাস তারাশংকরের লোকজীবনানুগত্যের উৎকৃষ্ট শিল্প-পরিচয়।

যন্ত্রসভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার বিরোধ, গ্রামীণ সমাজ ও ইন্‌ডোস্‌ট্রিয়াল সমাজের বিরোধ, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও বৃহৎ শিল্পনীতির অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জমিদার ও ব্যবসায়ীর বিরোধ, গ্রামীণ সমাজের শাসন, সংস্কার ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ : এইসব যুগ-পরিবর্তন তারাশংকর উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত করেছেন। এক্ষেত্রে অগ্রপথিকের গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

> এইসব যুগান্তরের আলেখ্য রচনা সম্পর্কে তারাশংকরের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : ১৯৩১ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্যসেবাকর্মে প্রথম ফল আমার 'চৈতালী ঘূর্ণি'। কাঁচা রচনা কিন্তু তার বিষয়বস্তু আমার দেখা জিনিস ; এক চাষী জমিদার ও মহাজনের শোষণে এবং অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়ে কলে শ্রমিক হল—তারপর মালিক-শ্রমিকের বিরোধের ফলে ওই লোকটির মৃত্যু হল। ভদ্রলোকের ছেলে পার্শ্বনায়ক সুরেন—সেও সত্য—সে আজও জীবিত—আজও সে দেশসেবায় নিযুক্ত রয়েছে বীরভূমে। তারপর কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম লিখেছি। তার মধ্যে আমার বিপ্লবের স্বরূপ কল্পনা আমার নিজস্ব। তার মধ্যে ন্যায়প্রধান, নীতিপ্রধান, সত্যপ্রধান এবং ঈশ্বরবিশ্বাস সুদৃঢ় অটল ; যে ন্যায়, যে নীতি, যে সত্যের জন্য বিপ্লবের কামনা—আবাহন, তার উৎস ঈশ্বর বিশ্বাস। তারই মধ্যে মৃত্যু—অমৃতরাজ্যের সেতু। ['শিল্পীর স্বাধীনতা', 'দেশ' ১৯৬২]

তারাশংকরের হাতে পুতুল নয়, প্রতিমা-ই খোলে ভাল। তাঁর ছোট গল্পও বীজাকারে উপন্যাস। উপন্যাসেই তাঁর সিদ্ধি। উপন্যাসের দাবি তিনি অনায়াসেই মেটান। বড় প্রেক্ষাপট, দেশকাল-আলিঙ্গিত জীবন, ব্যক্তির উপরে প্রাধান্যবিস্তারী জনপদ ও গোষ্ঠীজীবন, সেই গোষ্ঠীজীবনের প্রবাহ দেখবার উপযোগী বলিষ্ঠ তুলির টান, দৃঢ় গভীর রেখায় অঙ্কিত ছবি, ব্যক্তিসত্তা তার সব স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও অন্য কোনো প্রবলতর শক্তির করধৃত সূত্রে নিয়ন্ত্রিত, সেই অগম জীবনরহস্য যার অপর নাম নিয়তি তার কাছে ব্যক্তির পরাজয়, আর সেই নিয়তির ফ্রেমে-আবদ্ধ যুগান্তরের পটে গোষ্ঠীজীবন : এই সবই উপন্যাসের উপাদান। তাঁর ছোট গল্পেও তারাশংকর ক্রনিক্লার, তার পরিচয় রাবণেশ্বর রায় ('রায়বাড়ী'), বিশ্বম্ভর রায় ('জলসাঘর'), তরুবালা ('কুলীনের মেয়ে'), মঞ্জরী ('রসকলি', 'রাইকমল' উপন্যাসের পূর্বাভাস), নুটু মোক্তার ('নুটু মোক্তারের সওয়াল', 'দুই পুরুষ' নাটকের পূর্বাভাস)। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র পূর্বাভাস 'শ্মশানের পথে' গল্প। গল্প ও উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণে একই কৌশল অনুসৃত। রাবণেশ্বর রায়ের খড়মের শব্দে ও গম্ভীর কণ্ঠে কালী বাগ্‌দীকে আহ্বানে, তুফানের ক্ষুরধ্বনিতে ও জলসাঘরের দরজায় বিশ্বম্ভর রায়ের চাবুক আছড়ানোর শব্দে এক একটা গোটা মানুষ উঠে দাঁড়ায়, যেমন লম্বা বলিষ্ঠ তুলির টানে দৃঢ় গভীর রেখায় অঙ্কিত হয় ছিরু পাল, ন্যায়রত্ন, পূর্ণ চক্রবর্তী, শশী ডোম, শিবনাথ, বসন, ল্যালা, তারিণী মাঝি, নিতাই কবি, জীবন মশাই, গোরাবাবু, বলাই দাস, ডোমন কায়েত,

গঙ্গারাম, নাগু ঠাকুর, পিঙলা, অনিরুদ্ধ কামার, দুর্গা মুচিনী, পদ্ম কামারনী, বনোয়ারি, কালো বৌ, পরম, করালী, পাখী, সুচাঁদ, জীবন ডাক্তার, এমন কি বাঁশবাদির 'কালারুদ্দুর'।

২.৪ ॥ গোটা মানুষ, সজীব প্রকৃতি আর সমাজ-পরিবর্তনের খরস্রোত চিত্রণে তারাশংকরের অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁকে তাঁর কালের ক্রনিক্লার করে তুলেছে। বলেছি, তারাশংকর নিঃসন্দেহে আধুনিক ঔপন্যাসিক। এই বক্তব্য পুনর্বার সমর্থিত হয় তাঁর পরবর্তী বড়ো উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় (১৯৫১)। উপন্যাসের নাম 'উপকথা'। সন্দেহ নেই, টেল-ধর্মী কাহিনীতে এক নরগোষ্ঠীর আদিম বিশ্বাস সংস্কার ধর্মভাবনা অনুস্যূত হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, এই উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত।

আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনটি প্রধান উপাদান : অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন নিবিড় অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও নির্লিপ্তি। আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান দুটি লক্ষণ—প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে দেখা দেয় ও মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে ; এবং ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে গোষ্ঠীজীবনের সামঞ্জস্যে জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা এখানে অবশ্যস্মর্তব্য, আঞ্চলিক উপন্যাস যখন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে এক সংকেতধর্মিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তা সার্থক।

এইসব দিক বিচারে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র শিল্পসার্থকতা তর্কাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত। এ উপন্যাসে মানবচরিত্র ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী যোগ সাধিত হয়েছে। ভৌগোলিক সত্তা এখানে পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র চারিত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। এই উপন্যাসের প্রকৃতি কাহিনীর দিগন্তকে ঘিরে আছে, সেই সঙ্গে কাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। এখানে পটভূমির অতিব্যাপ্তি নেই, উত্তেজনা সঞ্চারের চাতুরি নেই, স্বল্প অভিজ্ঞতার চমক নেই। কোপাইদহের বেড় দিয়ে ঘেরা কাহারদের গ্রামের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। প্রকৃতির পরিবেশে বদ্ধমূল অ-প্রাকৃত সংস্কার, যুগ যুগ প্রচলিত কিংবদন্তী ও লোককল্পনা উপন্যাসটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। শিমুল, বেলবন, শ্যাওড়া বন, চন্দ্রবোড়া সাপ—সবকিছুতেই দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্ত্যজ নরগোষ্ঠীর লৌকিক ও অ-প্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এই কাহারগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বীরভূমের রুক্ষ উদাসীন সন্ন্যাসী প্রকৃতিই এখানে প্রতীক রূপ পেয়েছে 'কর্তাবাবা' ও 'কালারুদ্দুরে'র চরিত্রে। এই প্রকৃতিকে কাহারদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কাহারদের সমাজব্যবস্থাও এই প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বের দায়িত্ব, ব্যক্তির স্বাধীনতা-প্রয়াসের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা ও প্রবল হৃদয়াবেগের অনিবার্য লীলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্তঃসঙ্গতি-নিবিড় আঞ্চলিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্র রচনা করেছে। এই সমাজে যূথপতি বনোয়ারীলালের কথাই শেষ কথা। এখানে করালী ও পাখীর ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত, ভর্ৎসিত। 'বাবা কালারুদ্দুর' এই গোষ্ঠীর নিয়ন্তা—তিনিই এই সমাজকে চালনা করেন। তাঁর ক্রোধে বিনষ্টি, কৃপায় জীবনরক্ষা। কোপাইয়ের দহ, বাঁধ, বেলগাছ, বাঁশঝাড়, শিমুল ও শ্যাওড়া বন, অতীতের বন্যা, বর্তমানের যুদ্ধ—সবকিছুই কাহার-গোষ্ঠীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তারাশংকর এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে আদিম জীবনের বেধ উপস্থিত করেছেন।

অপর পক্ষে নতুন কালের অনিবার্য পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে লেখক বাস্তববোধ ও সামগ্রিক জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। পুরনো কাল তার সব বিশ্বাস সংস্কার ধারণা নিয়ে চলে যাচ্ছে, হেরে যাচ্ছে নতুন কালের কাছে। বনোয়ারীলালকে হেরে যেতে হয় করালীর কাছে, দেবতারূপে পূজিত চন্দ্রবোড়া সাপকে পুড়িয়ে মারলেও করালীর শাস্তি হয় না, ভদ্রবাবুসমাজের অপমান মাথা পেতে নিতে অস্বীকার করলেও সে মারা পড়ে না, পালকী বেহারার কাজ ছেড়ে দিয়ে

রেলস্টেশনে কারখানায় কাজ করে অর্থ অর্জনের দম্ভ প্রকাশের পরেও তার বিনাশ ঘটে না। এখানেই অনিবার্য পরিবর্তনের আঘাতে অবরুদ্ধ কাহারসমাজ কীভাবে ভেঙে যাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে বাহির বিশ্বে, তা নিপুণভাবে দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের সংলাপ ও মন্তব্য বিশ্লেষণে বীরভূম জেলার কোপাই তীরবর্তী আদিম নরগোষ্ঠীর বাগ্‌রীতির চমৎকার ও অব্যভিচারী প্রয়োগ হয়েছে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য়। এই ভাষা বাংলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক প্রতিরূপ। এর ভাব প্রকাশ করার ও ছবি ফুটিয়ে তোলার শক্তি অসাধারণ। এই আদিম নরগোষ্ঠীর সমগ্র জীবনদর্শন, এর অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, সহজ কবিত্বময় অনুভূতি, রসোজ্জ্বল জীবনবোধ ও দুর্বার যৌনাকাঙ্ক্ষার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। এই ভাষা চেতন মনের সীমা ছাড়িয়ে অবচেতন স্তরের অমূল্য ভাবস্পন্দনকে ধ্বনিত করেছে। কাহারগোষ্ঠীর বাগ্‌রীতির ভিতর দিয়ে মনের যে ছবি ফুটেছে তা শুধু বুদ্ধিশাসিত সুশৃঙ্খল সরলরেখাঙ্কিত বৃত্তি সমাবেশ নয়। এর মধ্যে বস্তুজ্ঞান ও অদৃশ্য ভীতির, মৃত্তিকা ও বায়ুস্তরের, জানা ও অজানার, ব্যবহারিক ও ঐন্দ্রজালিক উপাদানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। কাহারদের প্রত্যেকটি উক্তি ও কাজে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এই মিশ্র অনুভূতির পরিচয় পরিস্ফুট।

মাটি ও মানুষ এ উপন্যাসে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। 'কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে।' এই উপমাচিত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আভাস পাই। কোপাইয়ের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য :

> আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভরে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ী মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত-করে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট-পাটকেল-পাথর, দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কূলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনই ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী।

কোপাই নদীর এই দুর্বার উচ্ছ্বাস হাঁসুলী-বাঁকে বাঁশবাঁদি মৌজাভুক্ত কাহারগোষ্ঠীর নরনারীর জীবনে বারবার দেখা দিয়েছে। তারই বিচিত্র কাহিনী হাঁসুলী-বাঁকের উপকথা।

২.৫ ॥ তারাশংকর ক্রনিক্লার, বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজের ইতিহাস-লেখক। এই ইতিহাসের পূর্বসীমা পলাশীর যুদ্ধের বছর তিরিশ পূর্বেকার সময়, উত্তরসীমা সাম্প্রতিক মুহূর্ত (১৭২৭-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ)। পূর্বসীমায় আছে 'রাধা' (১৯৫৭)। উত্তরসীমায় আছে 'সুতপার তপস্যা' (১৯৭১)। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষে অজয় নদীর তটে 'রাধা'র কাহিনী-সূচনা। ইলামবাজারের বৈষ্ণবী নটী কৃষ্ণদাসী আর তার মেয়ে মোহিনীকে নিয়েই কাহিনী। বিচিত্র এই বৈষ্ণব সমাজ। কৃষ্ণদাসী প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় প্রভু মাধবের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আবার প্রভুর আরতি শেষ করে ব্যবসায়ী রাধারমণ সরকারের কুঞ্জে সাধনারাত্রি উদ্‌যাপন করতে যায়। কৃষ্ণদাসী রাধারমণের দুশ্চরিত্র ছেলে অক্রূরের কবল থেকে পঞ্চদশী কন্যা মোহিনীকে রক্ষা করতে চায়। ইতিহাসের বিশেষপর্বে এ উপন্যাসে লেখকের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। মুর্শিদাবাদ-হেতমপুর-বর্ধমান-পুরী-নবাব সুজাউদ্দীন-জাফর কুলী খাঁ—ইতিহাসের টানে বিচিত্র ছবি এসেছে। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব প্রেমধর্ম তখন খরস্রোতে বহমান নয়, মজা বদ্ধ বিল মাত্র। ইতিহাসের সেই বিচিত্র বৈভব আর সমারোহের

পটে নায়িকা পঞ্চদশী মোহিনীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নায়ক—এক নবীন সন্ন্যাসী—রাধা-ত্যাগী, শ্যাম-সর্বস্ব মাধবানন্দ। সে রাধা মানে না, মানে শুধু শ্যাম, অজয় নদের ওপারে শ্যামরূপের ঘাটে এসে নেমেছে, ভাঙা গড়ের পাশে বৈষ্ণবী-বর্জিত মঠ বানাবে। শেষ পর্যন্ত রাধা-ত্যাগী মাধবানন্দ মোহিনীর সামনে নতজানু হয়ে বলেছে—'তুমি রাধা—আমার রাধা'।

কথকতার বিচিত্র কৌশল, রোমান্সের বর্ণবিলাস, ইতিহাসের নানা আকর্ষক প্রসঙ্গ, রোমাঞ্চকর নাটকীয় মুহূর্ত, ধর্মের আচার ও বিকার, দেহভোগের বুভুক্ষা ও প্রেমের সৌকুমার্য, বৈষ্ণব সমাজের বিচিত্র রীতিনীতি অদূরবর্তী অষ্টাদশ শতকের বর্ণরঞ্জিত পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের কাহিনী। ১৩৫০, মন্বন্তর, ঝড় ও ঝরাপাতা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় চতুর্থ-পঞ্চম দশকের কাহিনী, সুতপার তপস্যা ও একটি কালো মেয়ে উপন্যাসদুটিতে ষষ্ঠ দশকের কাহিনী।

'সুতপার তপস্যা' তারাশংকরের উনশেষ উপন্যাস। বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমায় গঙ্গার ধারে একটি প্রাচীন গ্রাম সর্বানন্দপুর। সেই গ্রামের মুখুজ্জে ও দাশগুপ্ত দুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ে সুব্রত মুখার্জি ও সুতপা দাশগুপ্ত চিন্তায় কর্মে ধ্যানধারণায় বিপরীতপন্থী হয়েও প্রেমজ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১—আমাদের পরিচিত দশকের কলকাতা, কাটোয়ার গ্রাম, আসানসোলের কয়লাখনি, কংগ্রেসী ও বামপন্থী রাজনীতির তীব্র সংঘর্ষ ও হত্যার রাজনীতি, ধর্মবোধ বিশ্বাস সংস্কারের তিক্ত সংঘর্ষ, পারিবারিক দম্ভ নীচতা ব্যক্তিগত অসূয়া বিদ্বেষ—যা-কিছু আজ আমাদের জীবনের সমস্ত শুভকে বিনষ্ট করতে উদ্যত, তাদেরই চলন্ত ছবি।

সুতপা ও সুব্রতর মিলন সুখকর হয় নি। কারণ আমাদের পরিচিত অশান্ত অস্থির অবিশ্বাসী অসহিষ্ণু আঘাতোদ্যত বছরগুলিতে যে চঞ্চল তারুণ্য, তারই প্রতিনিধি এরা দুজন।

খুব স্পষ্ট করে দুজনের বিরোধ লেখক দেখিয়েছেন। পার্টি রাজনীতি, হত্যার রাজনীতি, অসহিষ্ণু উগ্রপন্থা : এসব আমাদের এত পরিচিত যে চিনিয়ে দিতে হয় না। তারই পটভূমিতে লেখক দুজনকে এঁকেছেন।

সুব্রতের চিঠি :

> একটি পুরুষ আর একটি নারী। সুতপা, এরা রাত্রে যে মিলনে মিলিত হয়—সেটি মেলে দুটি দেহের সেতুবন্ধের উপর দাঁড়িয়ে। দিনের মিলন মনে মনে। মতবিরোধ তখনই প্রমাদ ঘটায়। মানুষ ছাড়া প্রাণীজগতে দেহ-মিলনের পরেই একরকম পালা শেষ। মানুষ ঘর বাঁধে দিন রাত্রি, একসঙ্গে বাস করবে ব'লে।
>
> আমাদের মতের বিরোধ সেইখানেই সুযোগ পেলে মাথা তুলে দাঁড়াবার। আমরা ঠিক করেছিলাম—আমার মত আমার, তোমার মত তোমার। তৎসত্ত্বেও আমি তোমার, তুমি আমার।
>
> ভুল বোধহয় হল সেখানেই।
>
> আমি যখন তোমার হব—তখন আমার মতটাই বা তোমার হবে না কেন?
>
> আর তুমি যখন আমার হবে তখন তোমার মতটাই বা আমার হবে না কেন?

সুব্রতের সঙ্গে সুতপার মিল হল না। মিলবে কোন ক্ষেত্রে? পারিবারিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার ধ্যানধারণায় না আছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, না আছে বিশ্বাস। আসানসোলে কয়লা খনিতে শ্রমিক ইউনিয়ন দখলের লড়াইতে নিহত পাঁচজনের মধ্যে একজনের কাছে যে কাপড়জামা